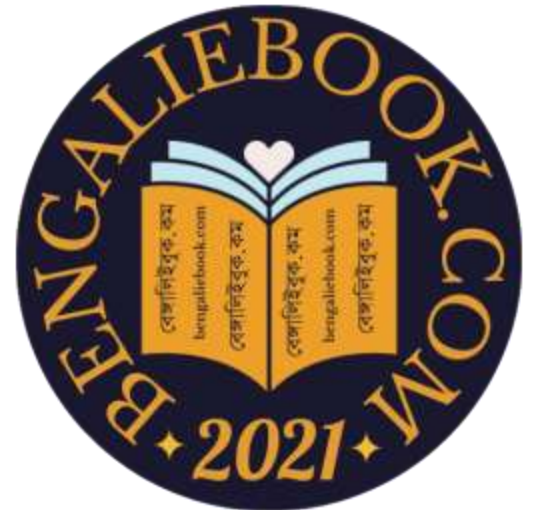


প্রবন্ধ

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলি এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতিকবি। তৎপরে কতকগুলি “কবিওয়ালার” প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু, ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে ততুল্য কিছু নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা, বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝাটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে

সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বকল্ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বকলের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহা গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্টিত, হস্তগত অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্য্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র, এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিষ্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরসগ্রাহিনী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্মানুকায়ী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে

লাগিল। ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্য নাটকাদি।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্ধ্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস ভোগাসক্ত গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত প্রস্ফুট করেন; আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্যচরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ক্রবল্লী, বাহুলতা, বিম্বেষ্টি, সরসীরহলোচন,

অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোনুখিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধঃ কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত কবিতা করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির দল মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাজ্ঞা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গলঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাঙ্কমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্নসমীরণের নিশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব-কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহা পুঞ্জানুপুঞ্জ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী-বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তি হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিশ্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth.